Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 401 - 411
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভানুবিল নাটকে প্রান্তিক কণ্ঠস্বর : ঔপনিবেশিক শোষণ, প্রতিরোধ ও আত্মপরিচয়ের সন্ধানে মণিপুরি জাতির নাট্যিক বয়ান

লাবনী আক্তার
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অভ লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ
Email ID: laboni.akter@ulab.edu.bd
0009-0003-5878-2519

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Subaltern Studies, Peasant Resistance, Colonial Exploitation, Manipuri Rebellion, Cultural Identity, Theatrical Narrative, Counter-History, Bishnupriya Manipuri, Bengali Theatre.

Abstract

This paper critically analyzes Shubhashish Sinha's play 'Bhanubil' as a significant contribution to the theatrical history of peasant resistance in Bangladesh. Moving beyond the dominant Bengali-centric narratives, the study focuses on the overlooked 1935 Manipuri peasant rebellion in Bhanubil. Drawing on the theoretical framework of Subaltern Studies, as articulated by Antonio Gramsci, Ranajit Guha, and Gayatri Chakravorty Spivak, this research argues that 'Bhanubil' functions as a "counter-history." It challenges conventional historical accounts by giving voice to the marginalized Manipuri community and their multi-layered struggles against historical-geographical displacement, economic-political exploitation, and cultural-linguistic suppression.

This paper employs a qualitative research methodology, utilizing critical theatrical analysis to examine Shubhashish Sinha's play 'Bhanubil.' The paper examines how the play's use of language—contrasting the landlords' hegemonic Bengali with the Manipuris' native Bishnupriya Manipuri—symbolizes the power dynamics and cultural resistance. It further demonstrates that the rebellion was not merely an economic protest against oppressive taxation and forced labor but a profound struggle for a unique cultural identity and existence. The analysis highlights how the rebellion united both Hindu and Muslim Manipuri communities, as well as men and women, against a common oppressor, underscoring its broad, inclusive nature. Furthermore, the study explores how the play's use of folk theatre techniques, music, and dance serves to preserve and present this oral history, making it a compelling and relevant document for contemporary discussions on marginalization and cultural preservation.

By analyzing the play's narrative and theatrical techniques, this study concludes that 'Bhanubil' is a powerful theoretical statement, proving that the subaltern can indeed speak through their own cultural and artistic mediums.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

The research asserts that this theatrical work ensures the rightful place of the Manipuri rebellion in historical discourse, moving it from the margins to the mainstream and providing a model for understanding similar struggles of oppressed communities worldwide.

Discussion

১. ভূমিকা : প্রান্তিকতার নাট্যভাষ্য ও একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিত - বাংলা নাটকের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহ এক চিরন্তন এবং শক্তিশালী ধারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক 'নীলদর্পণ'-এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক নীলকরদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের যে নাট্যিক সূত্রপাত ঘটেছিল, তা বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন নাট্যকারের কাজে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ শামসুল হকের 'নুরুলদীনের সারাজীবন' নাটকটি ১৯৪০-এর দশকের উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহকে মহাকাব্যিক রূপ দেয়। এই সকল নাটক একদিকে যেমন উপনিবেশিক শোষণ, সামন্তবাদী নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গল্প বলে, তেমনি অন্যদিকে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সংগ্রামী চেতনাকে তুলে ধরে। এই নাট্যিক ধারাটি সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন ও সংগ্রামকে মূলধারার সাংস্কৃতিক আঙিনায় নিয়ে এসেছে।

তবে, এই শক্তিশালী ধারার একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হল, এর প্রায় প্রতিটি আখ্যান প্রধানত বাঙালি কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশের অসংখ্য প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী ইতিহাস এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সংগ্রামের বহুমুখী দিকগুলো প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়। তাদের ইতিহাস মূলধারার বয়ানে হয় অনুপস্থিত, নয়তো বিকৃতভাবে চিত্রিত। এই প্রেক্ষাপটে, শুভাশিস সিনহা রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'ভানুবিল' একটি ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জের ভানুবিল এলাকার মণিপুরি কৃষকদের ১৯৩৫ সালের ঐতিহাসিক বিদ্রোহ নিয়ে নির্মিত এই নাটকটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়, বরং এটি বাংলাদেশের প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়, শোষণ-প্রতিরোধ এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার এক গভীর অনুসন্ধান।

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল, 'ভানুবিল' নাটকটি কীভাবে প্রান্তিকতার স্বরূপকে উন্মোচন করে, মণিপুরি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লড়াইকে তুলে ধরে, নাট্যরূপায়ণ কৌশলের মাধ্যমে সেই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে এবং এর মধ্য দিয়ে প্রচলিত ইতিহাসের একটি তুলনামূলক পাঠ উপস্থাপন করে তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণ কেবল একটি নাটকের শৈল্পিক বিচার নয়, বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাসচর্চা ও তাদের কণ্ঠস্বরকে মূলধারার আলোচনায় নিয়ে আসার একটি প্রচেষ্টা। এই প্রবন্ধে আমরা দেখব কীভাবে মণিপুরিদের বহুস্তরীয় প্রান্তিকতা, তাদের প্রতিরোধের জাগরণ, এবং তাদের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো নাটকের মূল কাঠামোর সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক বয়ান তৈরি করেছে।

২. তাত্ত্বিক কাঠামো : সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ও ভানুবিল নাটকের প্রাসঙ্গিকতা - 'ভানুবিল' নাটকের গভীর বিশ্লেষণ করার জন্য, প্রথমে আমাদের 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ' (Subaltern Studies) এর তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কটি বুঝতে হবে, কারণ এই নাটকটি সেই তত্ত্বের প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে। এই তাত্ত্বিক ধারাটি তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে - আন্তোনিও গ্রামসি, রণজিৎ গুহ এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক।

২.১. আন্তোনিও গ্রামসি ও হেজিমনি'র ধারণা - ইতালীয় মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামসি প্রথম 'সাবঅল্টার্ন' শব্দটি ব্যবহার করেন, যা দ্বারা তিনি সমাজের সেইসব নিম্নবর্গীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন, যারা মূলধারার ক্ষমতা কাঠামো থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন। গ্রামসি তাঁর 'প্রিজন নোটবুকস'-এ দেখিয়েছেন যে, শাসক শ্রেণি শুধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই শাসন করে না, বরং সংস্কৃতি ও মতাদর্শের মাধ্যমে 'হেজিমনি' (Hegemony) বা আধিপত্য তৈরি করে। এই

আধিপত্য এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে প্রভাবশালী বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং সামাজিক প্রথাগুলো সমাজের সকলের কাছে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়, যার ফলে নিম্নবর্গীয় শ্রেণি নিজেদের শোষণকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় এবং শাসক শ্রেণির ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়। গ্রামসির মতে, একটি শ্রেণি কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সম্মতি অর্জন করে। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ধারণাটিই 'ভানুবিল' নাটকের মূল দ্বন্দ্বকে বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাটকটি দেখায় কীভাবে শোষক শ্রেণি নিজেদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, আর শোষিতরা কীভাবে নিজেদের সংস্কৃতিকে প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

২.২. রণজিৎ গুহ ও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা - গ্রামসির ধারণার উপর ভিত্তি করে, ভারতীয় ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ এবং তাঁর সহকর্মীরা 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ' নামে একটি নতুন ইতিহাসচর্চার ধারা প্রবর্তন করেন। এই ধারার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে 'উপর থেকে' (elitist) না দেখে 'নিচ থেকে' (from below) দেখা। গুহ যুক্তি দেন যে, প্রচলিত ইতিহাস লেখা হয়েছে শোষক ও শাসক শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে কৃষকদের বিদ্রোহকে কেবল আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। কৃষকদের নিজস্ব চেতনা, সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্য সেখানে অনুপস্থিত ছিল। গুহ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India' তে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের 'বিদ্রোহ দমন' (counter-insurgency) বিষয়ক বয়ানের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কৃষকদের বিদ্রোহের নিজস্ব যুক্তি ও সংহতি ছিল, যা ঔপনিবেশিক দলিলে চাপা পড়ে গেছে। 'ভানুবিল' নাটকটি এই ইতিহাসচর্চার পদ্ধতির একটি সফল প্রয়োগ, যা মণিপুরি কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রতিরোধকে তুলে ধরে।

২.৩. গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ও 'Can the Subaltern Speak?' - রণজিৎ গুহের কাজের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর বহুল আলোচিত প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak?' এ এই প্রশ্নটি আরও গভীরে নিয়ে যান। তিনি দেখান যে, প্রান্তিক মানুষেরা কেবল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিতই নন, বরং তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরও প্রায়শই নীরব করে দেওয়া হয়। স্পিভাক যুক্তি দেন যে, যখনই সাবঅল্টার্নদের কথা বলা হয়, তা হয় মূলধারার মধ্যস্থতাকারী (intellectual) দ্বারা, যা তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে বিকৃত করে। তিনি দেখান যে, পশ্চিমা পণ্ডিতদের জ্ঞান উৎপাদন পদ্ধতি ঔপনিবেশিক ধারণারই পুনরুৎপাদন করে, যেখানে 'অন্য' (the Other) কে জ্ঞান আহরণের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্পিভাক 'সতী' প্রথার উদাহরণ দিয়ে দেখান কীভাবে ব্রিটিশরা 'বাদামী নারীদের বাদামী পুরুষদের হাত থেকে বাঁচানোর' নামে তাদের নিজস্ব ঔপনিবেশিক এজেন্ডা প্রচার করে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় নারীদের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণরূপে নীরব করে দেওয়া হয়।

'ভানুবিল' নাটকটি এই তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে একটি সরাসরি উত্তর হিসেবে কাজ করে। নাটকটি ঔপনিবেশিক ও জমিদার-শাসিত ইতিহাসের 'বিদ্রোহ দমন' বয়ানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রতিরোধের কারণ, কৌশল এবং পরিণতিকে উপস্থাপন করে। এটি স্পিভাকের প্রশ্নের উত্তরে প্রমাণ করে যে, সাবঅল্টার্নরা কথা বলতে পারে, যদি তাদের নিজস্ব মাধ্যমে, তাদের নিজস্ব গল্প বলার সুযোগ তৈরি হয়। এই সুযোগটিই তৈরি হয়েছে নাট্যকার শুভাশিস সিনহার নিজস্ব উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে, কেননা তিনি নিজেই মনিপুরি নৃগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি। নিজেদের প্রতিরোধের বয়ানকে নিজদের ভাষায় তুলে আনার ভেতর দিয়ে নিজস্ব স্বরের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নাটকের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার ব্যবহার এবং মণিপুরি সংস্কৃতির উপাদানগুলো এই নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই বিশ্লেষণ দেখায় যে, নাটকটি কেবল একটি শিল্পকর্ম নয়, বরং এটি একটি তাত্ত্বিক অবস্থান যা প্রমাণ করে যে, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিরোধের নিজস্ব মাধ্যমই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে দৃশ্যমান করতে পারে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : মণিপুরি নৃগোষ্ঠী ও ভানুবিল কৃষক বিদ্রোহের পরিচিতি - নাটকটির কেন্দ্রীয় উপজীব্য বিষয় এবং এর চরিত্রগুলো বোঝার জন্য প্রথমে এর মূল প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ মণিপুরি নৃগোষ্ঠী এবং ভানুবিল কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৩.১. মণিপুরি নৃগোষ্ঠী ও তাদের পরিচয় - মণিপুরিরা বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ আদিবাসী সম্প্রদায়। তাদের আদি নিবাস ছিল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্মি (Burmese) বাহিনীর আক্রমণে মণিপুর রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হলে এবং পরবর্তীতে বার্মা-মণিপুর যুদ্ধের কারণে বহু মণিপুরি নিজেদের দেশ ছেড়ে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাদের একটি বৃহৎ অংশ সিলেটের সীমান্তবর্তী মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এই দেশত্যাগের ঘটনাটি মণিপুরিদের সম্মিলিত স্মৃতির এক করুণ অধ্যায়। নতুন ভূমিতে তারা নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন করে একটি নতুন জীবন গড়ে তোলে। তবে, এই নতুন ঠিকানায় তাদের পরিচয় হয়ে ওঠে 'প্রান্তিক', যা নাটকটির মূল ভিত্তি তৈরি করে। মণিপুরিদের মধ্যে দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে - মৈতৈ (Meitei) এবং বিষ্ণুপ্রিয়া (Bishnupriya)।

৩.২. ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস - ভানুবিল কৃষক বিদ্রোহ ১৯৩৫ সালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা তৎকালীন সিলেট জেলার কমলগঞ্জ এলাকায় সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ শাসনামলের শোষণমূলক ভূমিব্যবস্থা এবং স্থানীয় জমিদারদের নিপীড়ন। জমিদারদের নায়েব রাসবিহারী দাসের দুর্নীতি এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রশিদ না দেওয়ার ঘটনা এই দীর্ঘদিনের শোষণেরই একটি অংশ ছিল, যা প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দেয়। ১৯৩৫ সালে যখন সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়, তখন ভানুবিলের জমিদাররা কৃষকদের ওপর নতুন করে নানা শোষণমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। এই আইন প্রজাদের কিছু অধিকার নিশ্চিত করলেও জমিদাররা তা মানতে রাজি ছিল না। আহমদ সিরাজের 'ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ : একটি সমীক্ষা' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, -

> "ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ... কেবলমাত্র পৃথিমপাশার জমিদার প্রভুর বিরুদ্ধেই সংগঠিত হয়েছিল এমন নয়, ইংরেজ শাসনের সমস্ত প্রথা পদ্ধতির বিরুদ্ধেও ছিল এই আন্দোলন।"[১]

এই দ্বৈত শোষণ মণিপুরি কৃষকদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে। তাদের উপর চড়া খাজনা, বেগার শ্রম এবং নানা ধরনের আবওয়াব (অবৈধ কর) চাপিয়ে দেওয়া হত, যা তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়।

ভানুবিল বিদ্রোহের সময়কাল নিয়ে একাধিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, যা এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক বিবরণকে আরও জটিল করে তোলে। একটি উৎস অনুসারে, এই বিদ্রোহ বাংলা ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (প্রায় ১৯০০-০১ খ্রিস্টাব্দ) সংঘটিত হয়েছিল, আবার আরেকটি উৎস এটিকে ১৯৩২ সালের একটি ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে। এই ধরনের ঐতিহাসিক অসংগতি বা ভিন্ন ভিন্ন তারিখের উপস্থিতিই 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ'-এর মূল প্রতিপাদ্যকে জোরালো ভাবে সমর্থন করে। মূলধারার লিখিত ইতিহাসে এই বিদ্রোহের সুনির্দিষ্ট ও একক কোনো বিবরণ নেই, যা প্রমাণ করে যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত নীরব করে রাখা হয়েছে। এই তথ্যটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ত্রুটি নয়; এটি প্রমাণ করে যে, মূলধারার ঔপনিবেশিক দলিলে প্রান্তিক মানুষের ইতিহাস যথাযথভাবে স্থান পায়নি, এবং এটি ছিল দীর্ঘদিনের শোষণের ফল, যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৩৫ সালের 'সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন' এর প্রেক্ষাপট। নাটকটি এই ঐতিহাসিক অসংগতির নীরবতাকে ভেঙে সেই ইতিহাসকে মঞ্চে জীবন্ত করে তোলে।

৪. বহুস্তরীয় প্রান্তিকতার স্বরূপ : ঔপনিবেশিক শোষণ ও আত্মপরিচয়ের সংকট - প্রান্তিকতা কোনো একক ধারণা নয়, এটি বহুস্তরীয়। এটি কেবল অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা বা ভৌগোলিকভাবে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই নয়, বরং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রান্তিকতাকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। 'ভানুবিল' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র

মণিপুরি কৃষকরা এই বহুস্তরীয় প্রান্তিকতার শিকার, যা তিনটি প্রধান স্তরে বিশ্লেষণ করা যায় – ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক-ভাষাগত।

৪.১. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক প্রান্তিকতা - মণিপুরিদের প্রান্তিকতার শুরু তাদের আদিভূমি মণিপুর রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে বসতি স্থাপনের করুণ ইতিহাস থেকে। ভূমিহীন হয়ে নতুন এক দেশে আশ্রয় গ্রহণ, যেখানে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনধারা ভিন্ন, তাদের এক ধরনের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। এটি কেবল শারীরিক বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং মানসিক শেকড়হীনতার যন্ত্রণা। ভানুবিল নাটকে আমরা পাই, -

> "হায় মণিপুর! হায় আদরের লোকতাগ! তোমার হৃদয়ে রাখা আমার তিয়াসটিকে যতনে রেখো তুমি; ও ইরং নদী, তোমার স্রোতে ভাসানো আমার সে স্বপ্নটিকে চিরজন্ম বয়ে নিও তুমি; ও নাগেশ্বর, বংশীবট, কেলিকদম্ব গাছ, আমাদের যেভাবে ছায়া দিয়ে নিজেদের শিশুর মতোন রেখেছিলে, সেভাবে তাদের রেখো, যারা ফের এসে তোমাদের ছায়ায় জিরোবে; ... বিষ্ণুপুর আর মোইরাঙ্গের মাটি, তোমার ধুলি শরীরে মেখে আমরা যাত্রা করলাম,আর আমাদের অপেক্ষায় থেকো না, পথ আমাদের যেখানে দাঁড় করাবে, সেখানে সাজিয়ে নেব নতুন জীবন, তোমরা পারনি,পারিনি আমরাও।"[২]

এই সংলাপটি কেবল অতীতের স্মৃতিচারণ নয়, বরং এক জাতিগোষ্ঠীর তার অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আত্মচিৎকার ও আত্মবেদনা। এভাবেই নাটকটির শুরুতেই নাট্যকার তার জাতিগোষ্ঠীর দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন।

৪.২. অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রান্তিকতা - উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন এবং তার অনুগত জমিদারদের শোষণমূলক ব্যবস্থার শিকার ছিল সমস্ত কৃষক সমাজ। কিন্তু মণিপুরি কৃষকরা ছিল এর মধ্যেও প্রান্তিক। ১৯৩৫ সালে যখন সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়, তখন ভানুবিলের জমিদাররা কৃষকদের ওপর নতুন করে নানা শোষণমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বৈঠক করে কৃষকরা স্থির সিদ্ধান্ত নেন, তারা জমিদারের খাজনা দেবেন না। পৃথিমপাশার জমিদার (আলি আমজদ খাঁ) এই খবর পেয়ে সমাজ প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন পঞ্চানন শর্মা, বৈকুণ্ঠনাথ শর্মা ও কাসেম আলি (মনিপুরি মুসলমান)। আলোচনার প্রথম পর্যায়ে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও জমিদার খাঁ সাহেব একসময় বুঝতে পারলেন, প্রতিনিধিদের তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে রাজি করানো যাবে না। তখন তিনি লাঞ্ছিত করার পথ বেছে নিয়ে তাদের কয়েদখানায় আটকে রাখলেন। বিষয়টি ভানুবিলের পুঁথিকাব্যে কবি বর্ণনা করেছেন এভাবে -

> "সাহেব বলেন প্রজাগণ বলি তোমাদের কাছে
> ভানুবিলের বহু খাজনা বাকি পড়িয়াছে।
> অল্পে অল্পে বাকি খাজনা পরিশোধ করিয়া,
> নতুন কবুলিয়াত দিবায় লেখিয়া।
> তারা কহে মিয়া সাহেব এমন কইবায় না
> প্রাণ থাকিতে কবুলিয়ত আমরা দিব না।
> যে সময়ে মনিপুরিগণ এ কথা কহিলা
> বারুদের ঘরে যেন আগুন লাগাইলা।
> হুকুম করিয়া সাহেব দেশওয়ালি ডাকিয়া
> পিলখানাতে মনিপুরি সব রাখ বান্দিয়া।"[৩]

ভানুবিল কৃষক আন্দোলন যখন জমিদারের খাজনা বন্ধের মাধ্যমে তীব্র রূপ ধারণ করল, তখন জমিদার ও ব্রিটিশ সরকার যৌথভাবে কৃষকদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে। সরকারের পুলিশ বাহিনী এবং জমিদারের লাঠিয়ালরা একত্রিত হয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কৃষকদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। এই দমননীতির শিকার হয়ে কৃষক নেতা বৈকুণ্ঠনাথ শর্মা ও পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে গ্রেফতার হন এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাসবিহারী দাসের দুর্নীতি এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রশিদ না দেওয়ার ঘটনা নাটকের একটি প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে চিত্রিত হয়েছে, যা কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণকে তুলে ধরে।

৪.৩. সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রান্তিকতা - ভানুবিলের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে মণিপুরিরা শোষিত কৃষকদের মধ্যেও প্রান্তিক, কারণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল বৃহত্তর বাঙালি সমাজ থেকে ভিন্ন। নাটকে এই ভাষাগত পার্থক্য অত্যন্ত কুশলীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মণিপুরি কৃষকরা তাদের নিজেদের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় কথা বলে, যা তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরে। অন্যদিকে, শোষক শ্রেণী— জমিদার ও তাদের পাইক-বরকন্দাজরা— বাংলা ভাষায় কথা বলে, যা ক্ষমতার প্রতীক। এই ভাষাগত বিভাজন কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি ক্ষমতা ও পরিচয়ের প্রতীক। যখন শোষক শ্রেণি নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন শোষিত শ্রেণি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্বকে রক্ষা করে। এই কৌশলটি প্রমাণ করে যে, সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো কেবল জাতিগত পরিচয়ের অংশ নয়, বরং শোষণের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদের হাতিয়ারও বটে।

৫. প্রতিরোধের জাগরণ: একটি কৃষক বিদ্রোহ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে - 'ভানুবিল' নাটকটি মণিপুরি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লড়াইকে তিনটি প্রধান ধাপে তুলে ধরে - শোষণ, প্রতিরোধ এবং আত্মপরিচয়। এই ধাপগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা একটি সামগ্রিক সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে।

প্রথমত, মণিপুরি কৃষকদের শোষণ কেবল অর্থনৈতিক ছিল না, এটি তাদের জাতিগত পরিচয়ের উপরও আঘাত হানত। জমিদারদের শোষণমূলক নীতি, যেমন নতুন কর আরোপ এবং ভূমি থেকে উচ্ছেদের হুমকি, তাদের অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তোলে। শুভাশিস সমীরের লেখা থেকে পাওয়া একটি গানে এই শোষণের নিষ্ঠুরতা ও জমিদারদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়; -

> "কে দেবে কার মাশুল!/ শোনো হে মিয়ারা, প্রমাণপত্র, আজ কথা বলে সব/ মায়াকান্নার যুগ শেষ, বৃথা ওইসব কলরব।/ তোমাদেরই কথা কতটুকু কও বিশ্বাস করা যায়/ বাপে আর পুতে মালিকে গোলামে কোথাও ভরসা নাই।"[৪]

এর বিপরীতে, শোষিত কৃষকদের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে এই অংশে –

> "হায় হায় হায় সকলি বৃথাই,/ কোথায় পালাই কোথায় লুকাই/ যেইখানে যাই জীবন তাড়ায়, তাড়া খেয়ে খেয়ে ছুটি/ ঘর ভেঙে যায়, চাল উড়ে যায়, ধইসা পড়ে রে খুঁটি।"[৫]

এই তুলনামূলক উদ্ধৃতিগুলো নাটকের মধ্যেকার শোষণের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, শোষণের বিরুদ্ধে মণিপুরি কৃষকরা সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ তাদের বিচ্ছিন্নতাকে ভেঙে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করে। এই আন্দোলন, যা স্থানীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছিল, ধীরে ধীরে বৃহত্তর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যায়। কংগ্রেস নেত্রী সুহাসিনী দাশের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, -

> "সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়াও ত্রিশের দশকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের খবরও শুনেছি। ভানুবিলের মনিপুরি কৃষক বিদ্রোহীরা প্রথমে নিজস্ব ধারায় আন্দোলন শুরু করলেও পরে কংগ্রেসকর্মীরা যুক্ত হয়েছিলেন।"[৬]

একটি স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করার প্রক্রিয়াটি একটি শক্তিশালী কার্যকারণ সম্পর্ক তুলে ধরে। এই বিদ্রোহ অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদ হিসেবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির সরাসরি হস্তক্ষেপ ও নিপীড়ন একে রাজনৈতিক রূপ দিতে বাধ্য করে। যখন কৃষকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের ঔদাসীন্য ও তাদের জমিদারদের পক্ষাবলম্বন প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের মূল প্রতিপক্ষ স্থানীয় শোষকরা নয়, বরং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র। এই প্রক্রিয়ায়, কৃষকদের দাবি 'ন্যায্য খাজনা' থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'স্বাধীনতা' ও 'স্বরাজ'-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এর মতো বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। এটি কেবল একটি ঘটনার বিবরণ নয়; এটি একটি রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে, যা প্রমাণ করে যে, প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তা বৃহত্তর ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে, এই সংমিশ্রণ সব ক্ষেত্রে সহজ ছিল না। চঞ্চলকুমার শর্মা তার 'সুরমা উপত্যকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; -

> "অবশ্য ভানুবিলের প্রজাআন্দোলন থেকে কংগ্রেসের সরে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণও রয়েছে। জমিদারবিরোধী কৃষক আন্দোলনে গান্ধিজীর দৃঢ় আপত্তি ছিল এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের বড় অংশ জমিদারদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষপাতি ছিলেন।"[৭]

এই তথ্যটি নাটকের প্রেক্ষাপটকে আরও জটিল ও বাস্তবসম্মত করে তোলে।

তৃতীয়ত, ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ কেবল শোষণের বিরুদ্ধে একটি লড়াই ছিল না, এটি ছিল আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের এক নতুন অধ্যায়। মণিপুর থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তারা নতুন করে নিজেদের সংস্কৃতিকে লালন করতে শেখে। নাটকের একটি গানে তাদের এই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়, -

> "কাটো জঙ্গল কাটো পাহাড়/ সাজাই এসো নতুন সংসার/... / হারায় ভূমি হারায় গো দেশ জীবন না ফুরায়/ এ পারে ঠাঁই হারালে সে, ওই পারে নেই ঠাঁই।/ সাজিয়ে যাও জ্বালিয়ে যাও সাত জনমের তারা।"[৮]

এই গানটি তাদের নতুন করে বাঁচার প্রত্যয় এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্তা ধরে রাখার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

৬. সংগ্রাম ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান : সংস্কৃতি, ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে ঐক্য - ভানুবিল কৃষক বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এটি ছিল মণিপুরিদের মধ্যেকার হিন্দু (বৈষ্ণব) ও মুসলিম (পাঙন) উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রতিরোধ, যা ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে গড়ে উঠেছিল। যদিও ঐতিহাসিক নথিপত্রে সরাসরি এই ঐক্যের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে বিদ্রোহের প্রকৃতি এবং তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নাট্যকার তার নাটকের বয়ানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঐতিহাসিক ভাবে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং তাদের অনুগত জমিদাররা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য 'ভাগ করো ও শাসন করো' (divide and rule) নীতি প্রয়োগ করত। তারা গোপনে হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলিম মৌলভীদের অর্থ দিত এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়াত। এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশে, যখন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কৃষকরা তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তখন তা কেবল অর্থনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; প্রান্তিক মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের শক্তিশালী রাজনৈতিক বিবৃতি হয়ে ওঠে। ভানুবিল বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল অতিরিক্ত খাজনা, অবৈধ কর এবং ভূমি থেকে উচ্ছেদের হুমকি, যা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের কৃষকের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল সার্বজনীন অর্থনৈতিক নিপীড়ন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় মণিপুরি সম্প্রদায়ের কৃষকরা একই সামন্তবাদী ব্যবস্থার শিকার ছিল। তাই, তাদের সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের পথ বেছে নেওয়া ছিল শোষকের বিভাজনমূলক নীতির বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সংহতির প্রতিফলন।

একইভাবে, এই আন্দোলনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণও ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংগ্রামে নারী নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম পরিবারের নারী জোবেদা খাতুন এবং বৈকুণ্ঠনাথ শর্মার মেয়ে লীলাবতি ও সাবিত্রির মতো তরুণীরা পুরুষদের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নেন, যা অন্য কৃষকদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে এটি অনুমেয় যে, ভানুবিল বিদ্রোহের মতো একটি জীবন-মরণ সংগ্রামে নারীরা কেবল নীরব দর্শক ছিলেন না। বরং তারা পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোকে ধরে রেখেছিলেন, পুরুষ যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন এবং সরাসরি বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। নাটকের লীলাদ্রোহ পর্বে লীলাবতীর কণ্ঠে শুনি, -

> "শোনো মা গো শোনো, ছাড়ো মা আমাকে আমিও নামব পথে
> খুলে দেব চুল, ভেঙে দেব চুড়ি কী লাভ নাকের নথে।

শোনো তুমি, বলি, একদিন রূপ-নারী চিত্রাঙ্গদা
নিয়েছিল তার হাতে তুলে এক শত্রুনাশের গদা।
আমি লীলা বলি আর চাইনাকো হারানোর এই দিন
নিজের রক্ত পানি করে থাকা আজীবন পরাধীন।
পরাধীন হায়, পরের অধীন মাটির এ অধিকার
সব দেখে দেখে আজ লেগেছে যে পিপাসার হাহাকার।
তৃষ্ণা লেগেছে বক্ষে আমার, আগুন যে দাউ দাউ
ছলাকলা করে রেখো না আমাকে ও-হাত সরিয়ে নাও।"[৯]

ইতিহাস জুড়ে অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়, যা প্রমাণ করে যে, এই ধরনের গণআন্দোলন কখনোই কেবল পুরুষের মাধ্যমে পরিচালিত হয় না। শুভাশিস সিনহার নাটকটি যেহেতু একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সংগ্রামকে তুলে ধরেছে, তাই এটি নিশ্চিতভাবেই একটি এমন প্রতিরোধের চিত্রায়ন যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের আত্মত্যাগ ও অবদান ছিল অবিচ্ছেদ্য। সম্মিলিত জাতিসত্তা, ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে এই ঐক্যই ভানুবিল বিদ্রোহকে একটি শক্তিশালী ও সফল গণজাগরণে পরিণত করেছিল।

৭. নাট্যরূপায়ণ কৌশল : লোকনাট্যরীতি, ভাষা ও প্রতীকী ব্যবহার - 'ভানুবিল' নাটকের নাট্যরূপায়ণ কৌশল অত্যন্ত মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকটির নাট্যরূপায়ন কৌশলেও আমরা শেকড় সন্ধানী রীতি দেখতে পাই যার ভেতর দিয়ে মণিপুরি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপস্থপনকে মঞ্চে জীবন্ত করে তোলে।

প্রথমত, নাটকের উপস্থাপনরীতি বর্ণনামূলক, যা আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য, যেমন গম্ভীরা বা আলকাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই কৌশলে নাটকের চরিত্রেরা সরাসরি নিজেদের কাহিনী বর্ণনা করে, যা দর্শকদের ঘটনার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি ইতিহাসের মৌখিক পরম্পরাকে জীবন্ত করে তোলে। এটি দর্শকের কাছে মনে হয় যেন তারা কেবল একটি নাটক দেখছেন না, বরং একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিকথা শুনছেন। এটি মণিপুরিদের মতো একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী কৌশল, যেখানে লিখিত ইতিহাসের চেয়ে মৌখিক ইতিহাস বেশি প্রচলিত।

দ্বিতীয়ত, নাটকের সংগীত ও নৃত্যও এর শৈল্পিক সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মণিপুরি সংস্কৃতিতে সংগীত এবং নৃত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে ব্যবহৃত এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং চরিত্রগুলোর আবেগ, হতাশা, এবং প্রতিরোধের সংকল্পকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কৃষকরা শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তখন তাদের মধ্যেকার ঐতিহ্যবাহী গান এবং নৃত্য তাদের সংহতি ও ঐক্যকে প্রকাশ করে। এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো নাটকের বর্ণনামূলক ধারাকে শক্তিশালী করে এবং দর্শকদের কাছে একটি জাতিগত পরিচয়ের গভীরতা তুলে ধরে।

তৃতীয়ত, নাটকের সংলাপে প্রায়শই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার ব্যবহার নাটকের বাস্তবতাকে আরও শক্তিশালী করে। এই ভাষাগত দ্বৈততা (দ্বিভাষিকতা) নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি একদিকে যেমন মণিপুরিদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি অন্যদিকে দর্শকদের কাছে তাদের ভাষাগত প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে। এটি দর্শকের মনে একটি প্রশ্ন তৈরি করে: যখন মূলধারার মানুষরা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে এবং একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা ব্যবহার করে, তখন এই দুই ভাষার মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক কী? এই ভাষাগত ব্যবহার প্রমাণ করে যে, নাট্যকার সচেতনভাবে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরকে তার নিজস্ব ভাষায় তুলে ধরতে চেয়েছেন, যা গায়ত্রী স্পিভাকের তাত্ত্বিক অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ভাষাগত দ্বৈততা কেবল একটি দ্বৈততা নয়, এটি একটি 'ভিজ্যুয়াল ড্রামাটুরজি' (visual dramaturgy) বা দৃশ্যমান নাট্য রূপায়ণের উদাহরণ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৮. ভানুবিল : এক কৃষক বিদ্রোহের নতুন বয়ান - ভানুবিল কৃষক বিদ্রোহের একটি বিশেষ দিক হলো, এটি অন্যান্য পরিচিত কৃষক বিদ্রোহ, যেমন নীল বিদ্রোহ বা তেভাগা আন্দোলন থেকে চরিত্রগতভাবে ভিন্ন। এই পার্থক্যটি বিশ্লেষণ করলে এই নাটকের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়।

শ্রেণিগত বনাম জাতিগত লড়াই - বাংলার অধিকাংশ ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ, যেমন ১৮৫৯ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৮৭৩ সালের পাবনা বিদ্রোহ এবং ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন, ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক শোষণ ও ভূমি অধিকারের লড়াই। এই আন্দোলনগুলোর চরিত্র ছিল মূলত 'শ্রেণিগত'। নীল বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ নীলকরদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি এবং জোরপূর্বক নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তেভাগা আন্দোলনও ছিল ভূমি অধিকারের লড়াই— ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের পাওয়ার দাবি। এই আন্দোলনগুলোতে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, ওঁরাও ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কৃষকরা একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের ঐক্যের ভিত্তি ছিল তাদের অভিন্ন শ্রেণিগত পরিচয়—বর্গাচাষী বা ভূমিহীন কৃষক। অর্থাৎ, তাদের লড়াই ছিল জোতদার বা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিন্ন অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদ।

অন্যদিকে, ভানুবিল বিদ্রোহ অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদ হিসেবে শুরু হলেও দ্রুত এটি একটি জাতিগত ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। এই বিদ্রোহের পেছনে ছিল শুধু খাজনার চাপ নয়, বরং একটি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয় রক্ষার তাগিদ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং জমিদারদের শোষণ ছিল শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত। তারা মণিপুরিদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে অবহেলা করত এবং নিজেদের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চাইত। এই কারণে ভানুবিলের বিদ্রোহকে কেবল অর্থনৈতিক আন্দোলন বলা যায় না, এটি ছিল একটি জাতির অস্তিত্বের লড়াই। এই বিষয়টি প্রবন্ধটিকে অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণের থেকে আলাদা করে তোলে এবং এর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সারণীটি বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রগত পার্থক্যকে স্পষ্ট করে। এটি দেখায় কীভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং জাতিগত উপাদানগুলো বিদ্রোহের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

বিদ্রোহের নাম	সময়কাল	মূল কারণ	প্রধান চরিত্র (শ্রেণি/জাতি)	মূল তাৎপর্য
নীল বিদ্রোহ	১৮৫৯-৬০	ব্রিটিশ নীলকরদের জোরপূর্বক নীল চাষ ও অর্থনৈতিক শোষণ।	প্রধানত বাঙালি কৃষক (হিন্দু-মুসলিম)।	ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কৃষক প্রতিরোধ, যা প্রধানত অর্থনৈতিক শ্রেণিগত ছিল।
পাবনা বিদ্রোহ	১৮৭৩-৭৬	জমিদারদের দ্বারা অতিরিক্ত খাজনা ও অবৈধ কর আদায়।	বাঙালি কৃষক ও প্রজা।	অহিংস প্রতিবাদের মাধ্যমে আইনি সংস্কারের দাবি এবং বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫-এর ভিত্তি স্থাপন।
তেভাগা আন্দোলন	১৯৪৬-৪৭	উৎপাদিত ফসলের ভাগ নিয়ে জোতদারদের সঙ্গে বিরোধ। দাবি: এক-তৃতীয়াংশ ভাগ।	ভূমিহীন বর্গাচাষী (হিন্দু-মুসলিম, সাঁওতাল, ওঁরাও)।	শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি দৃঢ় শ্রেণি-ভিত্তিক আন্দোলন।
নানকার বিদ্রোহ	১৯২২-৪৯	নানকার প্রথা, যেখানে কৃষকদের জমির উপর কোনো মালিকানা ছিল না এবং তারা জমিদারদের ভূমিদাস ছিল।	সিলেট অঞ্চলের নানকার প্রজারা।	সামন্তবাদী ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন, যা জমিদার প্রথার বিলুপ্তি ঘটাতে ভূমিকা রাখে।

ভানুবিল কৃষক বিদ্রোহ	১৯৩৫	জমিদারদের শোষণমূলক ভূমিব্যবস্থা ও নতুন কর আরোপ, সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন মানতে অস্বীকৃতি।	মণিপুরি আদিবাসী কৃষক।	অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি জাতিগত ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, যা একে একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে।

এই সারণীটি থেকে এটি স্পষ্ট যে, ভানুবিল বিদ্রোহ অন্যান্য বিদ্রোহের শ্রেণিগত চরিত্রের বাইরে গিয়ে একটি জাতিগত ও সাংস্কৃতিক মাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা এই নাটকের বিশ্লেষণকে একটি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

উপসংহার : একটি 'কাউন্টার-হিস্টরি' ও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা - 'ভানুবিল' নাটকটি কেবল একটি ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণ নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল যা প্রান্তিকতার ভেতর থেকে একটি জাতির কণ্ঠস্বরকে জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরেছে। এটি একটি 'counter-history' বা পাল্টা-ইতিহাস হিসেবে কাজ করে, যা প্রচলিত ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। রণজিৎ গুহের মতে, "বিদ্রোহের ইতিহাসে নিম্নবর্গের আত্ম-সক্রিয়তা ও স্ব-আশ্রিততা সর্বদাই সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান, এবং ঔপনিবেশিক দলিলে তা চাপা পড়ে গেছে"।[১০] নাটকটি এই চাপা পড়া ইতিহাসকে তুলে ধরে এবং প্রমাণ করে যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিজেদের ইতিহাস বলার ক্ষমতা আছে।

গায়ত্রী স্পিভাকের তত্ত্বের আলোকে, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার উপকূলের উদ্বাস্তুরা যারা নিজেদের ভিটা ও সংস্কৃতি হারিয়ে শহরে আশ্রয় নেয়, তাদের এই লড়াইকে প্রায়শই কেবল অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, তাদের মানবিক আর্তি বা সাংস্কৃতিক ক্ষতি উপেক্ষিত থাকে। একইভাবে, পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকরা যারা নামমাত্র মজুরিতে কাজ করেন, তাদের সংগ্রামকে 'উন্নয়নের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শুভাশিস সিনহার এই নাটকটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই সকল 'নতুন সাবঅল্টার্ন'-এর সংগ্রামও একইভাবে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সত্যিকারের মুক্তির পথ কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত নয়, বরং নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সসম্মানে ধরে রাখার মধ্যেও তা বিদ্যমান।

Reference:

১. আহমদ, সিরাজ, *ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ: একটি সমীক্ষা,* চারবাক ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ১
২. সিনহা, শুভাশিস, মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ ২য় খণ্ড, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১০৪
৩. আহমদ, সিরাজ, ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ: একটি সমীক্ষা, চারবাক ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ৩
৪. সিনহা, শুভাশিস, মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ ২য় খণ্ড, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১১২
৫. সিনহা, শুভাশিস, মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ ২য় খণ্ড, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১১২-১১৩
৬. আহমদ, সিরাজ, ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ: একটি সমীক্ষা, চারবাক ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ৯
৭. শর্মা, চঞ্চল কুমার, সুরমা উপত্যকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, আহমদ, সিরাজ, ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ: একটি সমীক্ষা, চারবাক ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ৭
৮. সিনহা, শুভাশিস, মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ ২য় খণ্ড, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১০৬
৯. সিনহা, শুভাশিস, মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ ২য় খণ্ড, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১৩৪
১০. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press, 1983. P. 71

Bibliography:

Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?". *Marxism and the Interpretation of Culture*, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, University of Illinois Press, 1988

Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press, 1983

সিংহ, রণজিৎ, ভানুবিল কৃষক প্রজা আন্দোলন বারোহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ, ১৯৮৫

আইয়োব, আলী আহাম্মদ খান, প্রান্তিক নৃ-গোষ্ঠীর বিদ্রোহ, ২০২০

বাংলাদেশের আদিবাসী, এথনোগ্রাফিয় গবেষণা- দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলাদেশের আদিবাসী ফোরাম, ২০১৫